ইউনিট ১৩

মানবদেহ

ভূমিকা

প্রাণিজগতে মানুষের স্থান শীর্ষে। অন্যান্য আর সব প্রাণীর মতো মানুষকে অবশ্য সাধারণ একটি প্রাণী বলা যাবে না। উন্নত মস্তিষ্ক, জ্ঞান, বুদ্ধি, ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ করার সীমাহীন ক্ষমতা, উন্নত স্বভাব, সামাজিকতা ইত্যাদি মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। মানুষ তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী এখন পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারে, খাদ্যবস্তু উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে, একসঙ্গে মিলে মিশে সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং কথা, ভাষা ও লেখার মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদান করতে পারে। এসবই সম্ভব হয়েছে তার উন্নত ও সুগঠিত মস্তিষ্ক ও কাজ করার উপযোগী দু'খানি হাত থাকার কারণে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বস্তুগত উৎকর্ষতা ও অগ্রগতি এবং পুঞ্জিভূত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কলাকৌশল পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তর করার ক্ষমতা কেবল মানুষেরাই আছে। অন্যান্য প্রাণীতে এ ক্ষমতা অতি সীমিত এবং তা বংশগতভাবে সহজাত ও পরিবর্তন আচরণ হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।

আমরা এ ইউনিটে মানবদেহের গঠন বৈশিষ্ট্য এবং সে সঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটি অঙ্গতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব। এ ছাড়া দুটি পাঠে খাদ্য ও পুষ্টি, সুষম খাদ্য, শিশু খাদ্য ইত্যাদি মৌলিক বিষয়েও আলোচনা থাকবে। সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য নিজ দেহ এবং খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে যেমন সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক তেমনি নিজেদের ধারণা স্বচ্ছ ও দীর্ঘস্থায়ী হলে পরবর্তীতে এসব বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

পাঠ- ১: মানব দেহ: গঠন বৈশিষ্ট্য, দেহের অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র, কংকালতন্ত্র
পাঠ- ২: মানব দেহ: রক্ত সংবহন, পরিপাক ও শ্বসনতন্ত্র
পাঠ- ৩: খাদ্য ও পুষ্টি
পাঠ- ৪: শিশু খাদ্য

পাঠ ১

মানবদেহঃ গঠন বৈশিষ্ট্য, দেহের অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র, কংকালতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মানবদেহের গঠন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্রের নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- মানুষের কংকালতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ সনাক্ত করতে পারবেন এবং
- কংকালতন্ত্রের কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।

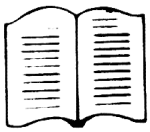

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে নানা জাতের মানুষ। বর্ণ, গোত্র, ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি ইত্যাদিতে বিস্তার পার্থক্য থাকলেও সব মানুষই একই প্রজাতির সদস্য। একজন স্বাভাবিক পরিণত বয়সের মানুষের উচ্চতা হয় ৫৬ থেকে ৭৮ ইঞ্চি। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। একজন বামন বা বেটে মানুষ উচ্চতায় হতে পারে মাত্র ১৮ থেকে ৩৬ ইঞ্চি, অপরদিকে দৈত্যাকার একজন মানুষের উচ্চতা ৯ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। ওজনের দিক থেকেও জাতি, উচ্চতা, বয়স ও লিঙ্গভেদে অনেক পার্থক্য হয়। সুস্বাস্থের অধিকারী একজন ২০–২৪ বছরের যুবকের গড় ওজন ৭০ কেজি এবং ঐ একই বয়সের একজন যুবতীর গড় ওজন ৫৬ কেজি। তবে একদিকে পুষ্টিহীনতা এবং অপরদিকে দেহে মেদ জমলে ওজনের অনেক হেরফের হয়।

দেহ বৈশিষ্ট্য

সোজা হয়ে দাড়াবার এবং সোজা হয়ে চলাফেরা করার ক্ষমতা মানুষের অন্যন্য বৈশিষ্ট্য। দেহের তুলনায় মস্তিষ্ক অনেক বড় ও জটিল কার্যাদি সম্পন্ন করার ক্ষমতা বিশিষ্ট। মুখ মন্ডল মসৃণ, চেপটা ধরনের। ত্বক পাতলা, নমনীয়। দেহের চুল খাট, পাতলা, মাথার চুলের বৃদ্ধি ঘটে সারা জীবন। দেহের তুলনায় হাত আনুপাতিক লম্বা। পা হাতের চেয়ে দৈর্ঘ্যে শতকরা ৩০ ভাগ বেশি, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল অন্যান্য আঙ্গুলের সাথে পরস্পর মুখোমুখী নয়। এছাড়াও মানুষের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা একান্ত্রভাবে তার নিজের, অন্যান্য প্রাণীদের সাথে তার মিল নেই।

দেহের অঙ্গ

অঙ্গের সংজ্ঞা

নির্দিষ্ট এক বা একাধিক কাজ করার জন্য দেহের বিভিন্ন কলা দলবদ্ধ হয়ে একত্রে যে বিশেষ গঠন তৈরি করে তাকে অঙ্গ বলা হয়। মানবদেহে নানা ধরনের অঙ্গ আছে। যেমন বৃক্ক একটি অঙ্গ। রেচন কাজ সম্পন্ন করার জন্য পেশী, যোজক কলা ইত্যাদির সমন্বয়ে বৃক্ক গঠিত। চোখ, কান, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত ইত্যাদি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

অঙ্গতন্ত্র

পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তিক কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কতকগুলো অঙ্গের সমন্বয়কে অঙ্গতন্ত্র বলা হয়। পেশীতন্ত্র, কংকালতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র ইত্যাদি মানবদেহের প্রধান অঙ্গতন্ত্র।

কংকালতন্ত্র

যে তন্ত্র দেহের কাঠামো তৈরি করে, দেহকে একটি নির্দিষ্ট আকৃতি দেয় ও নরম অঙ্গসম হকে সংরক্ষণ করে তাকে কংকালতন্ত্র বলা হয়। প্রাণিজগতে আমরা সাধারণত দুই ধরনের কংকালতন্ত্র দেখি: (১) বহিঃ কংকালতন্ত্র ও (২) অন্ত: কংকালতন্ত্র। চিংড়ি ও কীট পতঙ্গের বহিরাবরণী, ঝিনুক ও শামুকের খোলস, পাখির পালক, মাছের আঁইশ ইত্যাদি বহিঃকংকালের উদাহরণ। আমাদের দেহের চুল, নখ বহিঃকংকালের পর্যায়ে পড়ে। কোমলাস্থি ও অস্থির সমন্বয়ে গঠিত মানবদেহের যে কংকাল তা অন্ত:কংকালের পর্যায়ভুক্ত।

অন্ত:কংকালকে সাধারণত দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়: অক্ষীয় কংকাল ও উপাঙ্গীয় কংকাল। করোটি ও মেরুদণ্ডের সমন্বয়ে অক্ষীয় কংকাল গঠিত। অপরদিকে অক্ষীয় কংকালের সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় কংকালকে উপাঙ্গীয় কংকাল বলা হয়। হাত, পা, আঙ্গুলের অস্থিসমূহ এ শ্রেণির কংকালের অন্তর্ভুক্ত।

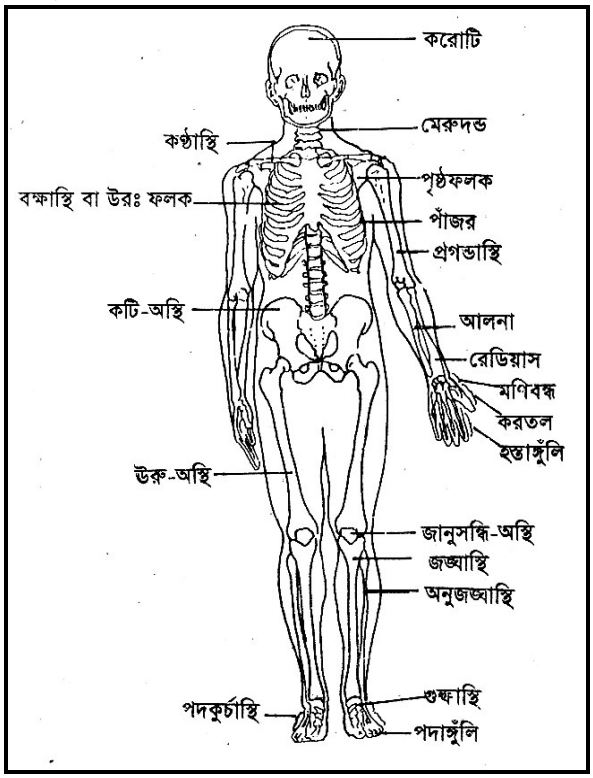

চিত্র ১৩.১.১: অন্ত:কংকাল।

অন্ত:কংকালের প্রকারভেদ

মানবদেহে মোট ২০৬টি অস্থি আছে। এর মধ্যে করোটি মস্তিষ্ক, চোখ ও অন্ত:কর্ণকে সংরক্ষণ করে। মেরুদণ্ড দেহের ভারবহন ও মূল কাঠামো গঠনে সহায়ক। সে সঙ্গে স্নায়ুরজ্জুকে খাপের মত ঘিরে রাখে। দেহের অন্যান্য অস্থি প্রধানত অঙ্গ প্রতঙ্গের চলন ও নড়াচাড়ার সঙ্গে জড়িত। আমাদের বহি: কর্ণ ও নাকের কাঠামো যে বিশেষ এক ধরনের অস্থিতে তৈরি তাকে কোমলাস্থি (Cartilage) বলা হয়। দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানেও মূল কংকালের সঙ্গে কোমলাস্থির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

করোটি

অনেকগুলো ছোট বড় পাতলা প্লেটের মতো অস্থির সমন্বয়ে মানুষের করোটি (Skull) গঠিত। করোটির উপরের অংশ করোটিকা (Cranium) এবং নিচের অংশ চোয়াল (Jaw)। করোটিকার সাথে চোয়াল কবজার মতো নমনীয়ভাবে সংযুক্ত থাকে। ফলে চোয়াল সহজেই মজবুতভাবে যুক্ত। করোটিকার কেন্দ্র বিন্দুতে সংরক্ষিত থাকে মস্তিষ্ক এবং চক্ষু ও কর্ণকোটরে সন্নিবেশিত থাকে চোখ ও অন্ত:ঃকর্ণ। করোটির পিছনের ফোরামেন ম্যাগনাস নামের ছিদ্রপথে মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুরজ্জু বের হয়ে মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। করোটির উল্লেখযোগ্য অস্থিগুলোর মধ্যে ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, অক্সিপিটাল ও টেমপোরাল তুলনামূলকভাবে বড়।

উপরের চোয়াল দৃঢ়ভাবে করোটির সঙ্গে যুক্ত এবং সমান ডান ও বাম অংশে বিভক্ত। এতে এক জোড়া ম্যাক্সিলারী এবং এক জোড়া জুগাল অস্থি থাকে। নিম্ন চোয়ালও দুইটি সমান অংশে বিভক্ত। নিম্ন চোয়ালের প্রধান অস্থি এক জোড়া ডেন্টারী।

মেরুদণ্ড

এক সারি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট অস্থি নিয়ে মেরুদণ্ড গঠিত। প্রতি অস্থি খণ্ডকে কশেরুকা (Vertebra) বলা হয়। বর্ণনার সুবিধের জন্য কশেরুকাগুলোর অবস্থান অনুযায়ী মেরুদণ্ডকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়: গ্রীবাদেশীয় (Cervical), বক্ষদেশীয় (Thoracic), কটিদেশীয় (Lumber) শ্রোণীদেশীয় (Sacral) এবং কক্সীজীয় (Coccygeal)। গ্রীবাদেশীয় সাতটি অস্থির মধ্যে প্রথম দুটিকে যথাক্রমে অ্যাটরাস (Atlas) ও অ্যাক্সিস (Oxis) বলা হয়। বক্ষদেশে থাকে মোট ১২টি অস্থি এবং এদের প্রতিটির সঙ্গে যুক্ত থাকে এক জোড়া করে বুকের পাঁজর (Ribs)। গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা, পাঁজর এবং স্টারনাম সম্মিলিতভাবে তৈরি করে বক্ষপিঞ্জর, যা হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসকে সংরক্ষিত করে ও শ্বসন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কটিদেশীয় কশেরুকার সংখ্যা পাঁচ। তুলনাম লকভাবে বড় এবং মজবুত। শ্রোণীদেশীয় পাঁচটি কশেরুকা একসঙ্গে মিশে গিয়ে সম্মিলিতভাবে স্যাকরাল নামে একটি মজবুত কাঠামো গঠন করে। এর সঙ্গেই শ্রোণীচক্র আটকানো থাকে। পশ্চাদদিকে স্যাকরাম

কক্সিক্স-এর সঙ্গে যুক্ত। চারটি ছোট কক্সীজীয় কশেরুকা এমনভাবে একত্রীভূত যে দেখে একটি মাত্র অস্থি মনে হয়।

সামনের দিকে মেরুদণ্ডের তিনটি অঞ্চলের প্রতিটি কশেরুকার মাঝে একটি করে কোমলাস্থির ছোট চাকতি চলাচল বা দৌড়াদৌড়ির সময় সন্নিহিত দুটি কশেরুকার সংঘর্ষ প্রতিরোধ করে।

বক্ষচক্র ও বাহু

উপাঙ্গীয় কংকাল: হাতের অস্থি ও বক্ষ চক্র এবং পায়ের অস্থি ও শ্রোণীচক্র সম্মিলিতভাবে মানুষের উপাঙ্গীয় কংকাল গঠন করে। এক জোড়া ক্লাভিকল এবং একজোড়া স্ক্যাপুলা-এর সমন্বয়ে তৈরি মানুষের বক্ষচক্র। বাহুর হিউমারাস অস্থিটির মাথা উপরদিকে স্ক্যাপুলার গর্তে ঢোকানো থাকে। আমাদের হাতের অন্যান্য অস্থিগুলোর নাম রেডিও-আলনা, কার্পালস্, মেটাকার্পালস ও ফ্যালানজেস। কব্জির ছোট ছোট অস্থিকে বলা হয় কার্পালস্। পাঁচটি মোটাকার্পলস্ অস্থি থাকে আমাদের হাতের তালুতে। মানুষের পাঁচটি আঙ্গুলে দুইটি এবং অন্য চারটি আঙ্গুলের প্রতিটিতে থাকে তিনটি করে।

শ্রোণীচক্র ও পা

ইলিয়াম, ইসচিয়াম এবং পিউবিস নামের একত্রীভূত তিনটি অস্থি নিয়ে মানুষের শ্রোণীচক্র গঠিত। দুই পাশের প্রতিটি শ্রোণীচক্রের খাঁজে বসানো থাকে পায়ের প্রথম অস্থি ফিমার-এর গোলাকার মাথা। পায়ের অন্যান্য অস্থির নাম টিবিয়া, ফিবুলা, টারসালস্, মেটাটারসালস্ ও ফ্যালানজেস্। হাতের মতোই পায়ের ১৪টি ফ্যালানজেস্ অস্থি অনুরূপভাবে সাজানো। অর্থাৎ প্রতিটি আঙ্গুলে থাকে তিনটি করে, আর বুড়ো আঙ্গুলে দুইটি। ফিমারের নিম্ন প্রান্তে ফিমার ও টিবিয়ার সন্ধি স্থলে বসানো থাকে প্যাটেলা নামে একটি গোলাকার অস্থি।

কংকালতন্ত্রের কাজ: কংকালতন্ত্রের প্রধান কয়েকটি কাজ নিচে উল্লেখ করা হল:

- কংকাল দেহের আকৃতিদানে সাহায্য করে।
- দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে।
- দেহের অভ্যন্তর ভাগের নরম অঙ্গগুলোকে সংরক্ষণ করে।
- অস্থিমজ্জা থেকে রক্তকণিকা তৈরি করে।
- পেশীসমূহকে আশ্রয়দান করে।
- দেহের যাবতীয় ভার বহন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. মানুষের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য–
   ক. দৌড়াদৌড়ি করার ক্ষমতা
   খ. সোজা হয়ে চলার ক্ষমতা
   গ. বড় আকারের করোটির উপস্থিতি
   ঘ. মাথায় চুলের উপস্থিতি।

২. মানুষের দেহে মোট অস্থির সংখ্যা–
   ক. ২৪০
   খ. ২০৬
   গ. ১০৫
   ঘ. কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই।

৩. মেরুদণ্ড যে ছোট ছোট অস্থিখণ্ড নিয়ে গঠিত তাদের নাম–
   ক. স্ক্যাপুলা
   খ. পিউবিস
   গ. কশেরুকা
   ঘ. ফিমার।

৪. রক্তকণিকা তৈরি হয়–
   ক. বৃক্কে
   খ. কশেরুকায়
   গ. অস্থিমজ্জায়
   ঘ. শ্রোণীচক্রে।

৫. নিচে চোয়োলের প্রধান অস্থি –
   ক. ডেনটারী
   খ. জুগাল
   গ. ম্যাক্সিলারী
   ঘ. প্যারাইটাল।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। খ, ৩। গ, ৪। গ, ৫। ক।

পাঠ ২

মানবদেহ: রক্ত সংবহন, পরিপাক ও শ্বসনতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- মানুষের রক্তসংবহনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ সনাক্ত করতে পারবেন;
- রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানুষের পরিপাকতন্ত্রের অঙ্গগুলো সনাক্ত করতে পারবেন;
- পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিপাকতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থিগুলোর ভূমিকা বলতে পারবেন;
- মানুষের শ্বসনঅঙ্গ, শ্বসন প্রক্রিয়া ও শ্বসনের শারীরবৃত্ত বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- রক্তসংবহনতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও শ্বসনতন্ত্রের কাজ উল্লেখ করতে পারবেন।

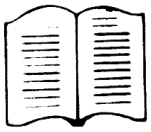

দেহকে সচল ও কার্যক্ষম রাখার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র সম্মিলিতভাবে পরস্পর সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের শারীরবৃত্তিক কার্যাদি সম্পন্ন করে। এসব তন্ত্রের কোনটির গুরুত্বই কম নয়। আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী ভিন্নতর হলেও তাদের সার্বিক ও সুষ্ঠ কার্যকারিতাই দেহকে সুস্থ ও সবল রাখে। এর কোন একটি কর্মক্ষমতা ব্যাহত হলে দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ পাঠে রক্তসংবহন, পরিপাক ও শ্বসনতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। ভালভাবে বুঝা ও জানার জন্য প্রতিটি তন্ত্রের বিভিন্ন অংশের চিত্রের সাহায্য আপনাকে নিতে হবে। আপনার শিক্ষার্থীরা যেন আপনার নিকট থেকে চিত্র আঁকার কৌশল শেখে সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

রক্ত সংবহনতন্ত্র

যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত প্রতিনিয়ত দেহের বিভন্ন অঙ্গ ও অংশ চলাচল করে তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলা হয়। মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র, রক্ত, রক্তবাহিকা ও হৃৎপিণ্ড নিয়ে গঠিত।

রক্তবাহিকা

রক্তবাহিকা (Blood Vessels) বলতে ধমনী, শিরা ও কৈশিক জালিকাসহ সব ধরনের রক্তনালী বুঝায়। যে রক্ত বাহিকার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে তাদের ধমনী (Artery) এবং যে সব বাহিকার মাধ্যমে রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা (Vein) বলা হয়। ধমনী শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হতে হতে যখন অতি সূক্ষ্ম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন তাদের কৈশিক জালিকা (Capillary) বলে।

রক্ত

রক্ত এক ধরনের তরল যোজক কলা। রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma) এবং কয়েক ধরনের রক্ত কণিকার (Blood Corpuscles) সমন্বয়ে রক্ত গঠিত। রক্তের রঙ বিহীন তরল অংশই প্লাজমা। আমাদের রক্তরসের শতকরা ৯২ ভাগই পানি। বাকি অংশে থাকে দ্রবীভূত আমিষ, কিছু জৈব যৌগ ও সামান্য অজৈব লবন। মানুষের রক্ত কণিকা তিন ধরনের: (১) লোহিত রক্তকণিকা (RBC), (২) শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) এবং (৩) রক্ত অণুচক্রিকা (Blood Platelets)। শ্বেত রক্তকণিকা আবার বেশ কয়েক ধরনের, যেমন- ইয়োসিনোফিল,

ব্যাসোফিল, নিউট্রোফিল, মনোসাইট ইত্যাদি। সবরকম রক্তকণিকাই রক্তরসে ভাসমান অবস্থায় থাকে। আমরা অনেক সময় রক্ত সিরাম (Blood Serum) শব্দটি শুনে থাকি। রক্ত থেকে লোহিতকণিকা এবং রক্ত জমাট বাধার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সরিয়ে নিলে রক্তের যে ইষৎ-হলুদ অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে সিরাম বলা হয়।

হৃৎপিণ্ড

রক্তসংবহনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হৃৎপিণ্ড। এর সাহায্যেই সংবহনতন্ত্রে রক্ত প্রবাহ সচল থাকে। হৃৎপিণ্ড সারাদেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে তা পুনরায় পাম্প করে সর্বত্র পাঠিয়ে দেয়। মানুষের হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণভাবে চার কামড়ায় বিভক্ত। এর উপরের দুটি ডান ও বাম অলিন্দ এবং নিচের দুটিকে ডান ও বাম নিলয় বলা হয়। অলিন্দের তুলনায় নিলয়ের প্রাচীর পুরু ও পেশীবহুল। কামড়ায় বিভক্ত থাকলেও গোটা হৃৎপিণ্ড একক (Unit) হিসেবে কাজ করে সম্পূর্ণ চারটি কামড়ায় বিভক্তির ফলে আমাদের হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেনযুক্ত ও কার্বনডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্তের সংমিশ্রণের কোন সুযোগ নেই।

রক্তসংবহন

মানুষের রক্ত সংবহন দুটি পৃথক পরিক্রমের (Circuit) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পরিক্রম দুটি সিস্টেমিক সংবহন ও পলিমোনারী সংবহন নামে পরিচিত।

সিস্টেমিক সংবহন

সব সিস্টেমিক ধমনীর উদ্ভব হয় অ্যাওর্টা থেকে আর অ্যাওর্টার উদ্ভব ঘটে বাম নিয়ল থেকে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের ফলে বাম নিলয় থেকে রক্ত প্রথমত অ্যাওর্টর ভিতর দিয়ে ধমনীতে প্রবেশ করে। পরে বিভিন্ন কলা ও অঙ্গের ধমনিকা ও জালিকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। জালিকা থেকে রক্ত পুনরায় সংগৃহীত হয়ে উপশিরার মাধ্যমে শিরায় প্রবেশ করে। সব শিরার রক্ত পরে প্রি-ক্যাভাল ও পোষ্ট-ক্যাভাল শিরা দিয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। বাম নিলয় থেকে শুরু করে ডান অলিন্দে পৌঁছা পর্যন্ত রক্ত সংবহনের যে পরিক্রম তাই সিস্টেমিক সংবহন।

পালমোনারী সংবহন

সিস্টেমিক সংবহনের মাধ্যমে রক্ত ডান অলিন্দে পৌঁছার পর সেখান থেকে ট্রাইকাসপিড কপাটিকার মধ্য দিয়ে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। ডান নিলয়ে প্রবেশের পরপরই হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের ফলে ফুসফুসীয় ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত ফুসফুসে গিয়ে ঢোকে। ফুসফুসের মধ্যে গ্যাসের বিনিময় ঘটে। রক্ত থেকে CO_2 অপসারিত হয় এবং সে সঙ্গে O_2 রক্তে যোগ হয়। রক্ত ফুসফুসের অ্যালভিওলি বা বায়ুকোষের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় অসংখ্য কৈশিক জালিকা ফুসফুসে প্রবিষ্ট বাতাসের নিবিড় সংস্পর্শে আসে। ফলে ব্যাপনের মাধ্যমে CO_2 বের হয়ে আসে, আর O_2 একই পদ্ধতিতে রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। নতুনভাবে অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়ে এ রক্ত ফুসফুসীয় শিরায় সংগৃহীত হয়ে তার মাধ্যমে বাম অলিন্দে গমন করে। বাম অলিন্দ থেকে বাইকাসপিড কপাটিকার ভিতর দিয়ে রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এভাবে ডান নিলয় থেকে রক্ত ফুসফুসে এবং সেখান থেকে বাম অলিন্দে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে সংবহনের যে সংক্ষিপ্ত পরিক্রম সম্পন্ন

হয় তাকে পালমোনারী সংবহন বলে। পালমোনারী সংবহনে হৃৎপিণ্ডে আনিত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পুনরায় সিস্টেমিক সংবহনের মাধ্যমে সারাদেহে প্রেরিত হয়।

হৃদঘাত

হৃৎপিণ্ডের ধারাবাহিক সঙ্কোচন ও শিথিলতার ফলে রক্ত দেহের বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করে। এ সঙ্কোচন ও শ্লথন সম্মিলিতভাবে হৃদঘাত (Heart Beat) নামে পরিচিত। হৃৎপিণ্ডের ছন্দায়িত এই যে স্পন্দন তা তার বিশেষ এক ধরনের পেশীর গুণে। এ পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণে মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

বিশ্রাম অবস্থায় একজন স্বাভাবিক মানুষের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ৭০ বার সঙ্কোচিত হয় এবং প্রতি স্পন্দনে প্রায় ৬০ মিলিলিটার রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশ ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু মানুষের দেহে রক্তের পরিমাণ প্রায় ৬০০০ মিলিলিটার তাই সম্পুর্ণভাবে সব রক্ত একবার হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে মাত্র ১০০ বার স্পন্দের প্রয়োজন হয়। অন্যভাবে বলা যায় প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ড থেকে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ প্রায় চার লিটার।

রক্ত সংবহনতন্ত্রের কাজ

রক্ত ও রক্ত সংবহনতন্ত্র আমাদের দেহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- সংবহনতন্ত্রের সহায়তায় খাদ্য সার, পানি, O_2, CO_2 হরমোন, ও বিভিন্ন বিপাকীয় দ্রব্যাদি দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয়।
- সংবহনতন্ত্র দেহের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- রক্তের শ্বেতকণিকা বিভিন্ন রোগ জীবাণু থেকে শরীরকে সংরক্ষণ করে।

পরিপাকতন্ত্র

শরীরের কাজে লাগাবার জন্য বিভিন্ন উৎসেচকের তৎপরতায় খাদ্য দ্রব্যকে যে এক বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে হয় তাকে পরিপাক বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমত সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। পরে কোষ আবরণীর ভিতর দিয়ে সহজেই তা অন্ত্রের কোষে প্রবেশ করে। সেখান থেকে পরিপাককৃত এ খাদ্যসার রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছায়। কিছু খাদ্য যেমন– পানি, গ্লুকোজ, খনিজ লবন ইত্যাদি খাবার পর কোন পরিবর্তন ছাড়াই সরাসরি দেহে শোষিত হতে পারে। কিন্তু জটিল শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য এভাবে কোষ আবরণী ভেদ করতে সক্ষম হয় না। তাই শর্করা খাদ্যকে সরল চিনিতে, আমিষকে অ্যামিনো এসিডে এবং স্নেহজাতীয় খাদ্যকে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডে পরিবর্তন করত হয়। পরিপাককৃত খাদ্য শরীরে শক্তি যোগায়, প্রোটোপ্লাজম তৈরি করে, হরমোন ও বিশেষ জাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, শরীরের বিভিন্ন কার্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য জমা থাকে।

গঠন

খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের জন্য আমাদের দেহে মুখগহ্বর, গলবিল, গ্রাসনালি, পাকস্থলী, অন্ত্র, মলাশয়, পায়ু এবং কয়েকটি গ্রন্থি নিয়ে পরিপাকতন্ত্র গঠিত। পৌষ্টিকনালীর শুরু মুখ থেকে এবং শেষ হয় পায়ুতে। পরিপাকতন্ত্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে গ্রন্থিগুলো সহায়তা করে তাদের মধ্যে লালাগ্রন্থি, যকৃত ও অগ্ন্যাশয় প্রধান।

কাজ

পরিপাকতন্ত্র প্রধানত তিনটি কাজ সম্পন্ন করে: (১) খাদ্য গলাধঃকরণ, (২) পরিপাককরণ ও শোষণ, এবং (৩) অপ্রয়োজনীয় খাদ্যাংশ দূরীকরণ।

পরিপাক প্রক্রিয়া

পরিপাক একটি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং মানুষে তা কেবল খাদ্যনালীতেই সম্পন্ন হয়। মুখ-গহ্বর সর্ব প্রথম খাদ্য গ্রহণ করে। এখানে কঠিন খাদ্য দাতের সাহায্যে পেষিত হয়। একাজে জিহ্বা সক্রিয় সাহায্য করে। খাদ্য চর্বিত ও পেষিত হবার সময় মুখের লালাগ্রন্থি থেকে লালা বা স্যালাইভা এসে মিশ্রিত হয়। স্যালাইভাতে স্যালিভারী অ্যামাইলেজ নামে এক উৎসেচক থাকে যা সাধারণত টায়ালিন (Ptyalin) নামে পরিচিত। স্যালাইভা গলধঃকরণের সুবিধার্থে খাদ্যবস্তুকে পিচ্ছিল করে এবং উৎসেচকের সাহায্যে স্টার্চকে ম্যালটোজে পরিণত করে।

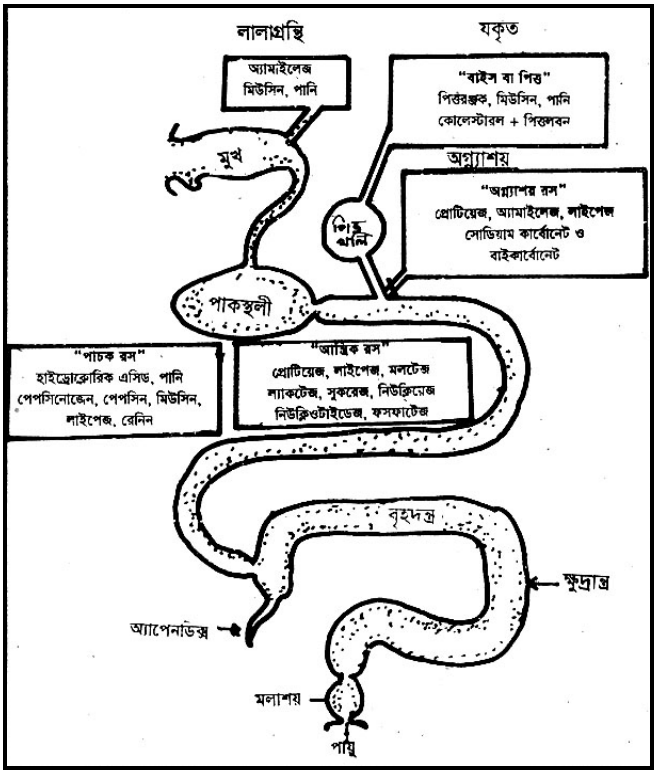

চিত্র ১৩.২.১: মানুষের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ, পরিপাকে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য এবং তাদের উৎস।

পাচক রস

মুখ থেকে খাদ্য গলবিল ও গ্রাসনালীর ভিতর দিয়ে পাকস্থলীতে এসে পৌঁছায়। পাকস্থলী প্রাচীরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো আছে হাজার হাজার ক্ষুদ্র গ্রন্থি যা থেকে 'পাচক রস' নিঃসৃত হয়। এসব গ্রন্থিতে তিন ধরনের কোষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে: (১) প্যারাইটাল কোষ যা থেকে HCL ক্ষরিত হয়, (২) চিফ কোষ যা পেপসিনোজেন ক্ষরণ করে, এবং (৩) মিউকাস কোষ যা থেকে মিউসিস উৎপন্ন হয়। পাচক রসে আরো দু'এক রকম রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়েছে। এর মধ্যে লাইপেজ ও রেনিন উল্লেখযোগ্য। নিঃসৃত এসব রাসায়নিক দ্রব্য বিভিন্নভাবে পরিপাকে অংশগ্রহণ করে।

আন্ত্রিক রস

পরিপাকের দিক থেকে ক্ষুদ্রান্ত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ অংশেই যকৃত ও অগ্ন্যাশয় থেকে নালী এসে অন্ত্রের সঙ্গে মেশে। অন্ত্র প্রাচীরে আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থি। এ সব গ্রন্থি থেকে বেশ কয়েক ধরনের উৎসেচকসহ যে রস নিঃসৃত হয় তা 'আন্ত্রিক রস' নামে পরিচিত। আন্ত্রিক রসের বিভিন্ন উৎসেচক বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পরিপাকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পরিপাক প্রক্রিয়ার অধিকাংশ কার্যাদির সমাপ্তি ঘটে অন্ত্রে এবং অন্ত্র প্রাচীরের কোষেই পরিপাককৃত খাদ্য সার শোষিত হয়। অন্ত্রের পেশীর চালনায় খাদ্যের বাকি অংশ ক্রমান্বয়ে বৃহদন্ত্রের দিকে পারিচালিত হয়। যদিও বৃহদন্ত্রের প্রধান কাজ খাদ্যের অবশিষ্ট অপাচ্য অংশ শরীর থেকে অপসারণ করা, তথাপি যুগপৎ কিছু প্রয়োজনীয় কাজও সম্পন্ন করে।

খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ বা 'কাইম' (Chyme) যখন বৃহদন্ত্রে এসে পৌঁছায় তখন এতে পানির পরিমাণ থাকে শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ। তা ছাড়া থাকে কিছু আমিষ, লিপিড, লবণ এবং উদ্বৃত্ত উৎসেচক। এসব থেকে বৃহদন্ত্র লবন ও পানি শোষণ করে তা রক্তে পাঠায়। ফলে উচ্ছিষ্ট খাদ্য ঘনিভূত মলে পরিণত হয়। মল মলাশয়ে সাময়িকভাবে জমা থেকে অবশেষে পায়ু পথে দেহ থেকে বের হয়ে আসে।

আমাদের দেহে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় বিভিন্ন ধরনের উৎসেচকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এসব উৎসেচকের উৎসও অনেকক্ষেত্রে ভিন্নতর। খাদ্য পরিপাকে যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদ্ভব হয় তা প্রধানত উৎসেচক দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

চিত্রে এবং ছকে মানুষের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ, পরিপাকে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, উৎসেচক ও তাদের উৎস, উৎপাদিত দ্রব্য ইত্যাদি দেখানো হয়েছে।

ছক: মানুষের পরিপাকে অংশগ্রহণকারী প্রধান উৎসেচক, তাদের উৎস এবং পরিপাক শেষে উৎপাদিত দ্রব্যের নাম।

পরিপাকতন্ত্রের অংশ	উৎসেচকের উৎস	প্রধান উৎসেচকের নাম	যে ধরনের খাদ্যের উপর ক্রিয়াশীল	উৎপাদিত দ্রব্য
মুখ	লালাগ্রন্থি নিঃসৃত লালা	টায়ালিন (সেলিভারী অ্যামাইলেজ)	শর্করা	ম্যালটোজ

পাকস্থলী	পাকস্থলীর গ্রন্থি নিঃসৃত ''পচক রস''	পেপসিনোজেন → পেপসিন লাইপেজ রেনিন	আমিষ স্নেহজাতীয় খাদ্য দুধের ক্যাসিন	প্রোটিওজেস, পেপটোনস এবং পোলিপেপটাইডস ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারিন প্যারাক্যাসিন
ক্ষুদ্রান্ত্র	ক্ষুদ্রান্ত্রের গ্রন্থি নিঃসৃত "আন্ত্রিক রস" অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত "অগ্ন্যাশয় রস"	ম্যালটেজ সুকরেজ ল্যাকটেজ প্রোটিয়েজ লাইপেজ প্রোটিয়েজ অ্যামাইলেজ লাইপেজ	শর্করা-ম্যালাটোজ শর্করা-সুকরোজ শর্করা-ল্যাকটোজ আমিষ-পেপটোন ও পেপটিডস স্নেহজাতীয় খাদ্য আমিষ শর্করা স্নেহজাতীয় খাদ্য	গ্লুকোজ গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ অ্যামিনো এসিডস ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারিন পেপটিডস্ ও অ্যামিনো এসিডস্ ম্যালটোজ ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল

যকৃত থেকে উৎপাদিত 'বাইল' বা পিত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য হলেও এতে পরিপাকের সহায়ক কোন উৎসেচক নেই। পরিপাকে কেবল পিত্ত লবনের ভূমিকা সক্রিয়।

অন্ত্রের ডুওডেনাম অংশের সন্নিকটে থাকে অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় ইনসুলিন নামের এক প্রকার হরমোন এবং কয়েকটি উৎসেচকসহ 'অগ্ন্যাশয় রস'। উভয়েই পরিপাকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ইনসুলিন সরাসরি রক্তে মিশে যায়। রক্তে শর্করা খাদ্য কাজে লাগাতে হরমোন অপরিহার্য।

শ্বসনতন্ত্র

বাইরের পরিবেশ থেকে প্রাণীদেহে অক্সিজেন গ্রহণ এবং শরীর থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করার শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়াকে শ্বসন বলা হয়। শ্বসনের মাধ্যমে কোষের ভিতরের খাদ্য O_2 এর সাহায্যে জারিত হয়ে CO_2 নির্গত হয় এবং খাদ্যের স্থিতি শক্তিকে গতি শক্তিরূপে মুক্ত করে।

মানবদেহে শ্বসনের জন্য ফুসফুসই একমাত্র অঙ্গ হলেও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি অঙ্গ যেমন গ্লটিস, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী ইত্যাদি মিলে শ্বসনতন্ত্র গঠিত। শ্বসন প্রক্রিয়ায় এসব অঙ্গের সরাসরি কোন ভূমিকা না থাকলেও ফুসফুসে বায়ু সংবহনে এরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

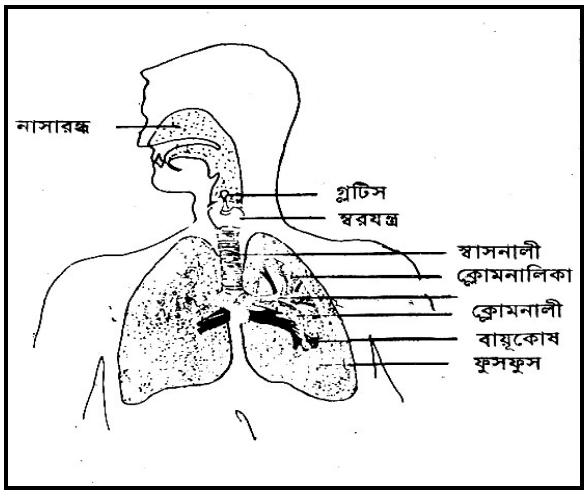

চিত্র ১৩.২.২: শ্বসনতন্ত্র।

গঠন

শ্বসনতন্ত্রের প্রথম অঙ্গ নাক। নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বাতাস পরিশ্রুত হয়ে ফুসফুসে যায়। মুখ বায়ু প্রবেশের বিকল্প পথ। তবে সাধারণ অবস্থায় মুখ দিয়ে বাতাস শ্বসনতন্ত্রে প্রবেশ করে না। নাক থেকে বাতাস গলবিলের ভিতর দিয়ে স্বরযন্ত্রে পৌঁছে। স্বরযন্ত্রের ঠিক পিছনেই শ্বাসনালী। মানুষের শ্বাসনালী চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। এটি ১৫-২০ টি রিং এর মতো কোমলস্থিতে তৈরি। ফলে কখনো চুপসে যায় না। শ্বাসনালী প্রথমত দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুটি ক্লোম নালী বা ব্রঙ্কি গঠন করে। প্রতিটি ক্লোমনালী পরে অসংখ্য ক্লোমনালিকা বা ব্রঙ্কিওলস্-এ বিভক্ত হয়। এক একটি ক্লোমনালিকা পরে বায়ুকোষ বা অ্যালভিওলাসের সঙ্গে গিয়ে মিশে। কার্যের দিক থেকে প্রতিটি অ্যালভিওলাস ফুসফুসের একক। শ্বাসকার্যে বাতাস ও রক্তের মধ্যে গ্যাসের যে বিনিময় তা কেবল এখানেই ঘটে। মানুসের ফুসফুসে ৩০ কোটি বা তারও বেশি বায়ুকোষ থাকে। এদের সম্মিলিত ভিতরের ক্ষেত্রফল ৪০ থেকে ৮০ বর্গ মিটার হবে বলে ধারণা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় একজন স্বাভাবিক মানুষের ফুসফুসের ক্ষেত্রফল একটি টেনিস কোর্টের সমান।

প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ফুসফুস ধুসর নীল রঙের এবং স্পঞ্জের মতো নরম। ডান দিকের ফুসফুস বামদিকের ফুসফুসের চেয়ে কিছুটা বড় ও চওড়া। মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রাম (Diaphragm) নামে একটি পেশীময় পর্দা বুকের যে অংশে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড থাকে সে অংশকে পেট থেকে আলাদা করে রাখে। শ্বাস-প্রশ্বাসে ডায়াফ্রাম ও পাঁজড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শ্বসন প্রক্রিয়া

শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া মূলত পেশী চালনার প্রভাবে সম্পাদিত হলেও একে বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসন এ দু'পর্যায়ে ভাগ করা যায়। বহিঃশ্বসনে ফুসফুস থেকে O_2 রক্তে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে CO_2 বাইরে আসে। অন্তঃশ্বসন বস্তুত কোষ পর্যায়ের শ্বসন। এ পর্যায়ে দেহকোষ ও রক্তের মধ্যে O_2 ও CO_2 এর বিনিময় ঘটে।

প্রশ্বাস

বহিঃশ্বসনকে পুনরায় প্রশ্বাস (Inspiration) এবং নিঃশ্বাস (Expiration) এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রশ্বাস কার্য সম্পন্ন হয় সমন্বিত পেশী সঙ্কোচনের মাধ্যমে, যার ফলে বক্ষ গহবরের আয়তন বাড়ে। বক্ষ গহবরের আয়তন বৃদ্ধি পেলে ফুসফুসও প্রসারিত হয়। এর ফলে বাইরে থেকে বাতাস নাক ও শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে অবিলম্বে ফুসফুস ঢুকে পড়ে। মনে রাখবেন, বক্ষের প্রসারণের ফলেই ফুসফুসে বাতাস ঢোকে, বাতাস ঢুকে বক্ষকে প্রসারিত করে না।

নিঃশ্বাস

নিঃশ্বাস বা শ্বাস ত্যাগের সময় যে ঘটনা ঘটে তা প্রশ্বাসের ঠিক বিপরীত। এ সময় প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িত বক্ষের সব পেশী হঠাৎ করেই শিথিল হয়ে আসে এবং বক্ষ প্রাচীর প্রসারিত ফুসফুসের উপর অবসন্নভাবে ঢলে পরে। এতে ফুসফুসের আয়তন কমে যায়। ফলে ভিতরের বাতাস দ্রুত বেরিয়ে আসে।

স্বাভাবিক অবস্থায় একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রতি মিনিটে প্রায় ১৫ বার শ্বাস-প্রশ্বাস ঘটে এবং প্রতিবার প্রায় ৫০০ মিলিলিটার বাতাস ফুসফুসে ঢোকে এবং বেড়িয়ে আসে।

শারীরবৃত্ত

ফুসফুসে বাতাসের অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অ্যালভিওলাসের আবরণী ভেদ করে কোষে পৌঁছে। সেখান থেকে একই প্রক্রিয়ায় O_2 রক্ত জালিকায় প্রবেশ করে। রক্তে লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে O_2 যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন করে।

$$\text{হিমোগ্লোবিন} + \text{অক্সিজেন} \rightarrow \text{অক্সিহিমোগ্লোবিন}$$

রক্ত প্রবাহের সঙ্গে অক্সিহিমোগ্লোবিন শরীরের বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয়। যেসব কলায় অক্সিজেনের চাহিদা রয়েছে সেখানে O_2 মুক্ত করা হয়। অক্সিজেন হারবার পর অক্সিজেনবিহীন লোহিত কণিকা শিরাগত রক্তের মাধ্যমে ফুসফুসে চলে আসে। অক্সিহিমোগ্লোবিন থেকে O_2 পৃথক করার ব্যাপারটা আসলে একটি বিজারণ প্রক্রিয়া।

শ্বসন প্রক্রিয়ায় O_2 গ্রহণ এবং CO_2 দুরীকরণ, এ দু'ধরনের বিপরীতমুখী ঘটনার অবতারণা হয়। CO_2 দূর করার কলাকৌশল একটু জটিল। দেহকোষ থেকে রক্তে ব্যাপনের সময় CO_2 কার্বোনিক এসিড (H_2CO_3)-এ রূপান্তরিত হয় এবং এ অবস্থায় রক্ত তাকে ফুসফুসের দিকে বহন করে নিয়ে যায়।

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$$
কার্বোনিক এসিড

বেশিরভাগ CO_2 রক্তে বাহিত হয় সোডিয়াম অথবা পটাসিয়াম বাইকার্বোনেট ($NaHCO_2$ or $KHCO_3$) হিসেবে। ফুসফুস জালিকায় পৌঁছালে কার্বোনিক অ্যানহাইড্রেজ নামক এক উৎসেচকের তৎপরতায় CO_2 মুক্ত হয় এবং সেখান থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রথমে ফুসফুসে ও পরে নাসারন্ধ্র পথে দেহের বাইরে চলে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. কোনটি ধমনীর মাধ্যমে হয়?
   ক. দুষিত রক্ত প্রবাহিত হয়
   খ. বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হয়
   গ. হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত দেহের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে
   ঘ. দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

২. ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে কিসের মাধ্যমে?
   ক. ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে
   খ. ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে
   গ. প্রি-ক্যাভাল শিরার মাধ্যমে
   ঘ. অ্যাওর্টার মাধ্যমে।

৩. নিচের কোন গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত হয়?
   ক. যকৃত থেকে
   খ. ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর গ্রন্থি থেকে
   গ. অগ্ন্যাশয় থেকে
   ঘ. লালাগ্রন্থি থেকে।

৪. পাকস্থলীতে HCL ক্ষরিত হয় কোন কোষ থেকে?
   ক. মিউকাস কোষ থেকে
   খ. প্যারাইটাল কোষ থেকে
   গ. চীফ কোষ থেকে
   ঘ. যকৃত কোষ থেকে।

৫. স্বাভাবিক অবস্থায় একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রতি মিনিটে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস ঘটে?
   ক. প্রায় ১০ বার
   খ. প্রায় ১৫ বার
   গ. প্রায় ২০ বার
   ঘ. প্রায় ৩০ বার।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ক, ৩। গ, ৪। খ, ৫। খ।

পাঠ ৩ খাদ্য ও পুষ্টি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খাদ্য কি তা বলতে পারবেন;
- পুষ্টি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পুষ্টিহীনতার কারণ উল্লেখ করতে পারবেন;
- পুষ্টিহীনতার ক্ষতিকর দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সুষম ও সুলভ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- সুষম ও সুলভ খাদ্য সনাক্ত করতে পারবেন এবং
- সুষম ও সুলভ খাদ্য ব্যবহারে উৎসাহী হবেন।

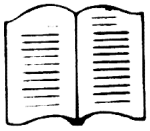

খাদ্য

আমাদের শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে হলে শক্তি ও তাপের প্রয়োজন হয়। এই শক্তি ও তাপ যোগায় খাদ্য। যখনই আমাদের তাপ ও শক্তির প্রয়োজন হয় তখনই আমাদের ক্ষুধা লাগে, আমরা খাদ্য খাই। তাহলে আমরা বলতে পারি দেহকে সুস্থ্য ও সবল, কর্মক্ষম এবং দেহের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন হয় সে সব উপাদান বিশিষ্ট বস্তুকে খাদ্য বলে।

পুষ্টি

এবার চলুন পুষ্টি বলতে আমরা কি বুঝি জেনে নেই। পুষ্টি হল একটি প্রক্রিয়া যাতে খাদ্যবস্তু খাওয়ার পর পরিপাক হয় এবং ভেঙ্গে সরল উপাদানে পরিণত হয়। এই সরল উপাদান দেহকোষ শোষণ করে নেয়। শোষিত হওয়র পর খাদ্যের উপাদান দেহের সকল অঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের পুনঃ গঠন ও দেহবৃদ্ধির জন্য নতুন কোষ তৈরির মাধ্যমে তাপ সৃষ্টি করে, রোগ প্রতিরোধ করে এবং স্বাস্থ্য ভাল রাখে। খাদ্যের এর সকল কাজকে আমরা পুষ্টি বলি। কিন্তু এই ব্যাপক কাজ কোন নির্দিষ্ট খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা সম্ভব নয়। আমরা যেসব খাদ্য গ্রহণ করি তার মধ্যে মোট ছয়টি উপাদান থাকে। যেমন-

- শর্করা
- স্নেহ পদার্থ
- আমিষ
- ভিটামিন
- খনিজ লবন এবং
- পানি।

আর যে খাদ্যে এই ছয়টি উাপাদান পরিমিত পরিমাণে রয়েছে তাকে আমরা বলি সুষম খাদ্য। এই খাদ্য ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক চাহিদা পূরণ করে এবং তাকে সুস্থ সবল ও রোগমুক্ত থাকতে সাহায্য করে।

সুষম খাদ্যের উপাদান

শ্বেতসার ৬০%	পানি
তেল ১৫%	খনিজ লবন ও ১০%
আমিষ ১৫%	ভিটামিন

শর্করা

শর্করা বা Carbohydrate জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরের বিভিন্ন কাজ কর্মের জন্য শক্তি যোগায়। চাল, আটা, ডাল, চিনি ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাদ্য খাওয়ার পর পরিপাক হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। গ্লুকোজ দেহের প্রতিটি কোষে আক্সিজেনের উপস্থিতিতে দাহ্য হয়ে পানি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও শক্তি তৈরি করে। শক্তি মাপার একক হচ্ছে কিলোক্যালোরী। কিছু শর্করা জাতীয় উপাদান দেহ গঠনে প্রয়োজন হয়। ডাটা, ফল, সবজির খোসায় ও শাকের ফাইবার মল তৈরিতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্ন দূর করে। প্রয়োজনের কম শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার প্রয়োজেনের বেশি ভাত, রুটি, মিষ্টি ইত্যাদি খেলে আমাদের শরীর মেদবহুল হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত শর্করা চর্বিরূপে জমা হয়ে দেহের ওজন বাড়ায় এবং নানারকম অসুখ যেমন- হৃদরোগ, ডায়বেটিস ইত্যাদি দেখা দেয়।

শর্করা জাতীয় খাদ্য হতে শক্তি পাওয়া যায়। অতি কম শর্করা গ্রহণে যেমন শরীর দুর্বল হয়, তেমনি অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণে শরীর মেদবহুল হয়।

প্রোটিন

আমিষ বা Protein জাতীয় খাদ্য আমরা উদ্ভিদজ্জ ও প্রাণীজ উভয় উৎস থেকেই পেয়ে থাকি। দুধ, ডিম,মাছ, মাংস, ডাল, বাদাম ও বিচিতে বেশি পরিমাণ প্রোটিন থাকে। নানা রকমের উদ্ভিজ্জ খাদ্য যেমন- ডাল, চাল, আলু, বিচি একসাথে মিশিয়ে রান্না করলে সে খাবারে প্রোটিনের মান উন্নত হয়। যেমন- খিচুড়ি, হালিম, ইত্যাদি। দেহের কোষবৃদ্ধি ও ক্ষয়প রণে এটি অপরিহার্য। প্রোটিন জাতীয় উপাদান দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়। আমরা আমাদের চারপাশে তাকালে দেখতে পাবো, জন্মের পর প্রোটিনের অভাব দেখা দিলে শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না। শিশুরা উচ্চতায় ও ওজনে বাড়ে না। শিশুর দেহ রুগ্ন হয়ে পড়ে, চামড়ায় ঘা হয় এবং অনেক সময় মুখ, হাত ও পা ফুলে ওঠে।

প্রোটিন জাতীয় খাদ্য দেহের ক্ষয়প রণ ও বৃদ্ধি সাধনে অপরিহার্য। এর অভাব শিশুদের জন্য মারাত্মক হতে পারে।

তেল

তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ হচ্ছে শক্তি উৎপাদন। আমরা প্রাণিজ উৎস থেকে তেল, মাংসের চর্বি, দুধের সর, মাখন, ঘি ইত্যাদি পেয়ে থাকি আবার সয়াবিন তেল, সরিষার তেল, বাদাম তেল, নারকেল তেল, তিলের তেল এবং ডালডা উদ্ভিজ উৎস থেকে পাই।

তেল দেহের শক্তি উৎপাদনে অপরিহার্য। অতিরিক্ত চর্বি গ্রহণে নানা রকমের অসুখ হয়।

ভিটামিন

টাটকা শাক-সবজি, ফল থেকে আমরা বেশি পরিমাণ ভিটামিন পাই। ভিটামিন নানা রকমের আছে। ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন রকম রোগ দেখা দেয়। ভিটামিন 'সি'র অভাবে স্কার্ভি এবং ভিটামিন 'ডি'র অভাবে রিকেট রোগ হয়। রোগ প্রতিরোধের জন্য দৈনন্দিন স্বাভাবিক খাবারে ভিটামিন থাকতে হবে। ভিটামিন সব ধরনের তাজা শাক-সবজি যেমন- কলমী শাক, লাউ শাক, পালং শাক, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, টমেটো, লেবু ও ফল যেমন- পেয়ারা, কামরাঙ্গা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে থাকে।

সব রকম খাবার খেলে ভিটামিনের অভাব হয় না। ভিটামিন 'এ'র অভাবে রাতকানা, ভিটামিন 'ডি'র অভাবে রিকেট, ভিটামিন 'সি'র অভাবে স্কার্ভি ইত্যাদি হয়। তাই স্বাস্থ্য রক্ষায় ভিটামিনের গুরুত্ব অনেক।

পানি

দেহকে সুস্থ্য রাখতে পানি অপরিহার্য। পানি পরিপাকে এবং রক্তে খাদ্য পরিবহনে সাহায্য করে এবং বর্জ পদার্থ মূত্ররূপে নির্গত করে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এছাড়া দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। অতিরিক্ত ঘামে, বমি ও ডায়রিয়াতে দেহে পানির অভাব ঘটে এবং কোষে পানি কমে যায়। ফলে শরীরে রক্তচাপ কমে যায়, জিহ্বা শুকিয়ে যায় এবং প্রকট হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। তাই প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করা আবশ্যক। পানি খুব সহজেই দূষিত হয় এবং মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে। তাই খাওয়ার পানি অবশ্যই বিশুদ্ধ, জীবানুমুক্ত হওয়া উচিত। মনে রাখা উচিত- পানি ফুটন্ন অবস্থায় পৌঁছার পর আধা ঘন্টা ফুটানো হলে তা জীবাণুমুক্ত হয়।

পানির অপর নাম জীবন। তাই প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করা আবশ্যক।

খনিজ লবন

কয়েক রকমের খনিজ পদার্থ রয়েছে। এদের মধ্যে ক্যালসিয়াম, লৌহ ও আয়োডিন উল্লেখযোগ্য। দুধ, পনির, ছোট মাছের কাঁটা, কলমী শাক ইত্যাদিতে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। কলিজা, ডিম, মাংস ইত্যাদিতে লৌহ এবং সামুদ্রিক মাছ ও লবনে আয়োডিন পাওয়া যায়। এ সমস্ত উপাদান দেহের কাজে সাহায্য করে। আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড, লৌহের অভাবে রক্ত শূন্যতা, ক্যালসিয়ামের অভাবে রিকেট ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হয়।

খাদ্যের এই ছয়টি উপাদান প্রধানত আমাদের দেহে তিনটি কাজ করে–

- বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- তাপ উৎপাদন ও কর্মশক্তি প্রদান।
- রোগ প্রতিরোধ ও সুস্থ্যতা বিধান।

সতেজ ও কর্মক্ষম শরীরের জন্য খনিজ পদার্থের ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুষ্টিহীনতার কারণ ও ক্ষতিকর দিক

আমরা প্রতিদিন যে খাবার খাই সেই খাবারের মধ্যে যদি খাদ্যের ছয়টি উপাদানের যে কোন একটি উপাদান দেহের চাহিদার তুলনায় অপরিমিত থাকে অথবা সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়ে তখন সেই উপাদানের অভাবে দেহে পুষ্টির অভাব ঘটে। দীর্ঘদিন পুষ্টির কাজে ব্যাঘাত ঘটলে দেহে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতার লক্ষণ দেখা দেয়। শিশুদের কোয়াশিয়রকর,

মেরাসমাস, রিকেট, রাতকানা ইত্যাদি রোগ পুষ্টিহীনতার কারণে হয়ে থাকে। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ জন লোকই অপুষ্টিতে ভোগে। ফলে তাদের স্বাস্থ্য দুর্বল, কর্মক্ষমতা কম এবং অনেকের অকাল মৃত্যু ঘটে। আমরা আমাদের চারপাশে একটু ভাল করে তাকালেই বুঝতে পারবো এর প্রধান কারণ হলো দারিদ্রতা, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা। অজ্ঞতা আর কুসংস্কার সৃষ্টি হয় শিক্ষার অভাবে। আবার শিক্ষার জন্য চাই অর্থ। সে কারণে আমরা দেখতে পাই দরিদ্র জনগণই অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের অক্টোপাশে আবদ্ধ। কাজেই দারিদ্রতাই পুষ্টিহীনতার মূল কারণ। আবার অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত একটি শিশু পরিবারের কল্যাণের পরিবর্তে নিয়ে আসে অকল্যাণ ও দুঃখ। সেই শিশুকে সুস্থ্য করে তোলার জন্য পরিবারের সামান্য আয়ের বেশির ভাগই খরচ হয় বলে অন্যান্য সদস্যগণ অর্থাভাবে অপুষ্টিতে ভোগে ও কর্মক্ষমতা হারায়। ফলে পরিবারটি ক্রমশঃ দরিদ্র হতে থাকে। তাই দারিদ্রতা যেমন- পুষ্টিহীনতার কারণ, তেমনি পুষ্টিহীনতাও দারিদ্রতার কারণ। একটি অপরটির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। জনসংখ্যার কথাও আমাদের এখানে ভাবতে হবে। কারণ একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু আবাদযোগ্য জমি বাড়ছে না। এছাড়া অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা এ সবতো আছেই। ফলে খাদ্য ঘাটতি মারাত্মক পর্যায়ে নেমে এসেছে।

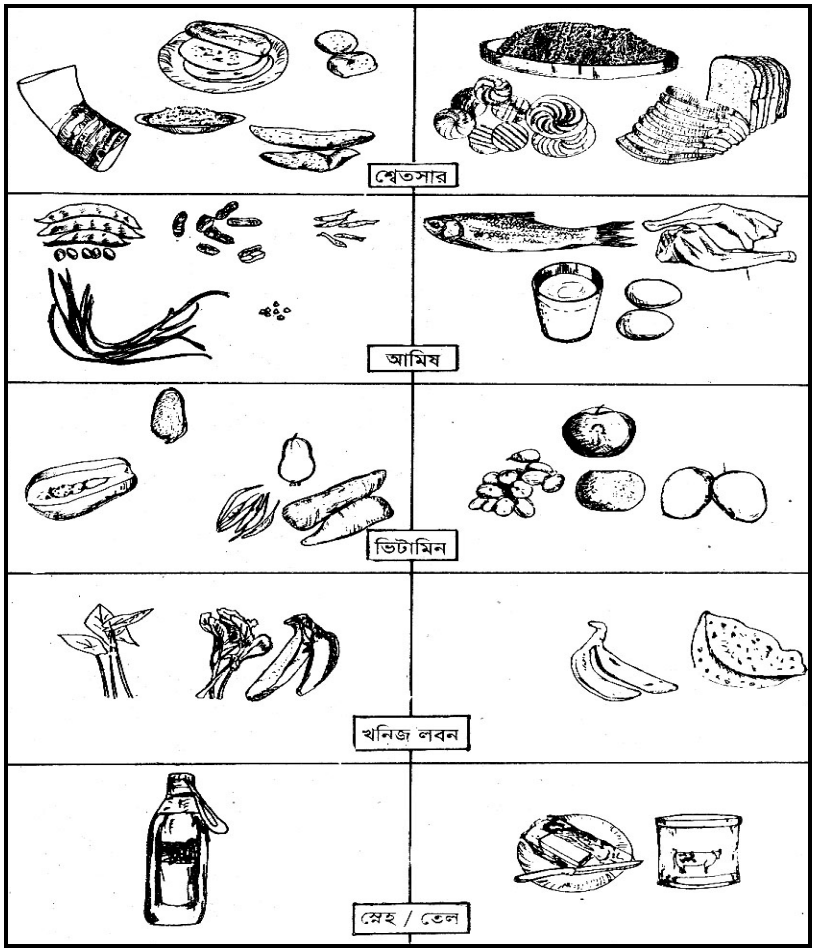

চিত্র ১৩.৩.১: সুষম ও সুলভ খাদ্য।

সুষম সুলভ খাদ্য

এহেন পরিস্থিতি থেকে আমাদের রক্ষা পেতে হলে প্রথমেই আমাদের সুষম খাদ্য গ্রহণ করার অভ্যাস করতে হবে। সুষম খাদ্য অর্থ শুধু দামী খাবার নয়। স্বল্প ব্যায়ে আমাদের হাতের কাছের সহজলভ্য জিনিস থেকে আমরা সুষম খাদ্য পেতে পারি। তাই পুষ্টি জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে এবং এ জ্ঞান সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো আমাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ও অধিক আয়ের ব্যক্তির খাদ্য নির্বাচন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তারা মনে করেন যে, খাদ্য গ্রহণ করা হোক না হোক স্বাদটাই প্রধান। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, স্বাদের জন্য খাদ্য নয়, স্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য। স্বল্প খরচেও আমরা সুষম খাদ্য পেতে পারি। এজন্য দরকার খাদ্য ও এর উৎস সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা।

খাদ্য উপাদান	উৎস (সস্তা ও সহজলভ্য)
শর্করা	চাল, গম, আলু, আটা, প্রভৃতি
প্রোটিন	ছোট মাছ, ডাল, চিনা বাদাম প্রভৃতি
স্নেহ	সয়াবিন, নারিকেল তেল প্রভৃতি
ভিটামিন	আমলকি, পেঁপে, কাঠাল, কচুশাক প্রভৃতি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. পুষ্টির অভাবজনিত রোগ নয় কোনটি?
   ক. বেরিবেরি
   খ. মেরাসমাস
   গ. হৃদরোগ
   ঘ. রাতকানা।

২. ভিটামিন 'ডি'র অভাবে যে রোগ হয় তাহল–
   ক. রিকেট
   খ. রাতকানা
   গ. ডায়রিয়া
   ঘ. স্কার্ভি।

৩. পুষ্টিকর খাদ্যের অর্থ হল–
ক. মুখরোচক খাদ্য
খ. বেশি দামী খাদ্য
গ. শরীরের চাহিদা মত খাদ্য
ঘ. চর্বি জাতীয় খাদ্য।

৪. সুষম খাদ্য তালিকা তৈরির গুরুত্ব কি?
ক. তৃপ্তিসহ খাদ্য গ্রহণ করা যায়
খ. খাদ্য গ্রহণে বৈচিত্র্য আনা যায়
গ. পুষ্টি সমস্যা সমাধান করা যায়
ঘ. খাদ্যের সদভ্যাস গঠন করা যায়।

৫. খাদ্যের উপাদান প্রধানত কয়টি?
ক. চারটি
খ. দুইটি
গ. ছয়টি
ঘ. আটটি।

৬. পুষ্টিহীনতার মূল কারণ–
ক. শিক্ষার অভাব
খ. কুসংস্কার
গ. দারিদ্রতা
ঘ. পুষ্টিজ্ঞানের অভাব।

৭. দেহকে সুস্থ্য ও সবল রাখার জন্য প্রয়োজন–
ক. দামী খাদ্য
খ. সুস্বাদু খাদ্য
গ. অধিক খাদ্য
ঘ. সুষম খাদ্য।

৮. খাদ্য নির্বাচনের সময় কোনদিকে বেশি লক্ষ্য দিতে হবে?
ক. খাদ্যের উপাদান ও পরিমাণ
খ. দামী ও ভাল খাদ্য
গ. সহজপাচ্য ও তৃপ্তিদায়ক খাদ্য
ঘ. পুষ্টিকর ও রুচিপূর্ণ খাদ্য।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ক, ৩। গ, ৪। গ, ৫। গ, ৬। ঘ, ৭। ঘ, ৮। ঘ।

পাঠ ৪ শিশু খাদ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিশু খাদ্য কি তা বলতে পারবেন;
- শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিশুদের মায়ের দুধ খাওয়াবার স্বপক্ষে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করবেন এবং
- স্বাস্থ্য গঠনে দুধের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিশু খাদ্য

একটি মানব শিশু অসহায় অবস্থায় পৃথিবীতে আসার পর সব রকম খাদ্য হজম করার ক্ষমতা থাকে না। তখন শিশুর একমাত্র গ্রহণযোগ্য খাবার হলো মায়ের দুধ। পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসক ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, মাতৃদুগ্ধের বিকল্প কিছু নেই। শিশুর জন্মের পর থেকে ৫ মাস পর্যন্ত কেবলমাত্র মায়ের দুধই শিশুর সব রকম খাদ্যের প্রয়োজন মিটায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ ব্যবস্থা কেবলমাত্র একজন সুস্থ্য মা ও তার সন্তানের জন্যই প্রযোজ্য। যদি কোন কারণে মাতৃস্তন্যের ঘাটতি পড়ে তা হলে তার বিকল্প হিসাবে গরু বা ছাগলের দুধে প্রয়োজন মত পানি মিশিয়ে খাওয়াবেন। গরু বা ছাগলের দুধের অভাবে আপনি বাজারের গুড়া দুধও খাওয়াতে পারেন। শিশুর পাঁচ মাস বয়সের পর একমাত্র মায়ের দুধ শিশুর দেহ বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। তখন দুধের পাশাপাশি শিশুকে অন্য খাবার দিবেন। যেমন- আলুসেদ্ধ, চটকানো ভাত-ডাল, সেদ্ধডিম, দুধের তৈরি সুজি, পায়েস, পাকা কলা, পাকা পেঁপে, পাকা আম, সেই সাথে মাছ, মাংস ও সবজির স্যুপ।

দুধের পাশাপাশি মা শিশুকে অন্য খাবার দিচ্ছেন।

চিত্র ১৩.৪.১: মা ও শিশু।

মাতৃদুগ্ধের গুরুত্ব

শিশুর শরীর খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিশুর দেহ সুস্থ্য সবলভাবে গড়ে উঠার জন্য শিশুর খাদ্যে, খাদ্যের ছয়টি উপাদানই থাকা একান্ত প্রয়োজন। আপনারা জানেন দেহ গঠনের সব উপাদানই মায়ের দুধে রয়েছে। এই পুষ্টিগত মান ও আদর্শ খাবার হিসাবে মায়ের দুধই শিশুর সর্বশ্রেষ্ঠ খাবার। শিশুর জন্মের পরেই মায়ের বুকে শালদুধ নামে ইষৎ হলুদ যে দুধ জমা থাকে তা শিশুর জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এ দুধে শিশুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কলস্ট্রাম থাকে। শিশুকে অবশ্যই এই শালদুধ খাওয়াবেন। এই দুধ খুবই পুষ্টিকর, নিরাপদ এবং শিশুর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। জন্মের পর থেকে পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াবেন। বুকের দুধ খাওয়ালে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বাড়তি পানির প্রয়োজন হয় না। ফলে পানি খাওয়ানোর জন্য শিশুর পাতলা পায়খানা বা অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

পরীক্ষা ও গবেষণায় দেখা যায়, মানবশিশুর মস্তিষ্ক গঠনের জন্য যেসব বিশেষ উপাদান প্রয়োজন, তা মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যায়। গরু, ছাগল বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য শিশুকে খাওয়ালে শিশুর মস্তিষ্ক গঠনের এই সক্ষম প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

মায়ের দুধ প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি এবং শিশুকে খাওয়ানোর জন্য বোতল, নিপল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না, কৃত্রিম দুধ ব্যয় বহুল। দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে অনেক মা তাদের ভুল ধারণা ও কুসংস্কারের জন্য শিশুর প্রাপ্য বুকের দুধ থেকে শিশুকে বঞ্চিত করছেন। অথচ শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে না বললেই চলে।

মায়ের দুধ সহজপ্রাপ্য, জীবণুমুক্ত ও দেহ গঠনের উপযোগী। কাজেই শিশুর জন্য পর্যাপ্ত দুধ পেতে হলে, দেহকে পুষ্টিহীনতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে মাকে অবশ্যই পুষ্টিকর ও বাড়তি খাবার খেতে হবে।

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক পরিপূর্ণতার জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই।

স্বাস্থ্য গঠনে দুধ

গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং সুষম উপাদানের জন্য দুধ প্রকৃতির যে কোন খাদ্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত। শিশুর বৃদ্ধি, যুবকের শক্তি, বৃদ্ধের জীবনধারণ এবং অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় দুধের দান অপরীসীম। দুধের পুষ্টিগত মান হিসাবে দুধকে সুষম খাদ্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। সুষম খাদ্যের ছয়টি উপাদানই এই দুধের মধ্যে আছে যার কারণে দুধ একটি আদর্শ খাদ্য হিসাবে পরিচিত।

দুধে আছে প্রোটিন যা কি না অন্যান্য সকল প্রোটিনের গড় পরিপাকের তুলনায় বেশি। দুধের প্রোটিনে লাইসিন এবং ট্রিপটোফেন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। উদ্ভিদ জাতীয় প্রোটিনে এই অ্যামাইনো এসিডদ্বয়ের ঘাটতি বা সম্পূর্ণ অভাব থাকে। তাই দুধের

প্রোটিন এবং উদ্ভিদ প্রোটিন একসাথে পান করলে দুধের প্রোটিনের উদ্ধৃত্ত লাইসিন এবং ট্রিপটোফেন উদ্ভিদ প্রোটিনের অন্যান্য অ্যামাইনো এসিডের সংমিশ্রণে শরীর কলা এবং দেহ প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে। সুতরাং দুধের প্রোটিন উদ্ভিদ প্রোটিনের পুষ্টিমানের ঘাটতির সম্পূরক বলে পুষ্টিবিদগণ দুধের প্রোটিনকে পুষ্টির সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। দুধের চর্বি বা স্নেহ পদার্থ বা মাখন অন্যান্য যে কোন চর্বি হতে পছন্দনীয়, কারণ এর স্বাদ ও গন্ধ অন্য যে কোন স্নেহ পদার্থ থেকে উৎকৃষ্ট। দুধে অপরিহার্য ফ্যাটি এসিড প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

ল্যাকটোজই একমাত্র শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় উপাদান যা শুধু দুধেই পাওয়া যায়। পুষ্টি হিসাবে ল্যাকটোজ অন্যান্য শ্বেতসার অপেক্ষা অনেক উন্নতমানের। ল্যকটোজের উপস্থিতিহেতু অন্যান্য খাদ্যের ক্যালসিয়ামের তুলনায় দুধের ক্যালসিয়াম সহজেই হজম ও পরিপাক হয়।

দুধে খনিজ পদার্থের মধ্যে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, জিংক, ক্লোরিন, আয়রন, কপার, ম্যাংগানিজ এবং আয়োডিন। এই সমস্ত খনিজ পদার্থ আমাদের পুষ্টির জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য রক্ষা ও প্রজননের জন্য ভিটামিন অবশ্যই অতি প্রয়োজনীয়। পুষ্টির জন্য অতি অল্প পরিমাণেই এদের প্রয়োজন। দুধ প্রায় সকল ভিটামিনই ধারণ করে। ইহা রিবোফ্লাভিন সমৃদ্ধ।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দুধ এমন একটি আদর্শ খাদ্য যা কি না পুষ্টিমানের বহুলাংশে মিটাতে সক্ষম। অধিকন্তু দুধ সহজেই হজম হয়। দুধ সুস্বাদু ও পছন্দনীয়। দুধের তৈরি রসগোল্লা, সন্দেশ, চমচম, রসমালাই, দই, ছানা ইত্যাদি নিয়মিত ব্যবহারের একদিকে যেমন স্বাস্থ্য রক্ষা করে অন্যদিকে অতিথিয়তার কাজ করে।

দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। দৈনিক প্রতিটি মানুষের দুধ খাওয়া প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. শিশু শুধুমাত্র মায়ের দুধ পান করবে-
   ক. এক মাস পর্যন্ত
   খ. তিন মাস পর্যন্ত
   গ. পাঁচ মাস পর্যন্ত
   ঘ. সাত মাস পর্যন্ত।

২. দেহ গঠনে খাদ্যের সব উপাদানই আছে-
   ক. মাংসে
   খ. দুধে
   গ. খিচুরীতে
   ঘ. সব্জিতে।

৩. শাল দুধ খেলে শিশুর-
   ক. দেহের বৃদ্ধি ঘটে
   খ. মস্তিষ্ক গঠন ব্যাহত হয়
   গ. প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে
   ঘ. পেটে অসুখ হয়।

৪. শিশুর শক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়-
   ক. ৩ মাস বয়স থেকে
   খ. ৬ মাস বয়স থেকে
   গ. ৮ মাস বয়স থেকে
   ঘ. ১২ মাস বয়স থেকে।

৫. মাতৃদুগ্ধের বিকল্প-
   ক. গরু, মেষ বা ছাগলের দুধ
   খ. ভাতের ফেন
   গ. সব্জির স্যুপ
   ঘ. তাল মিছরির শরবত।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। খ, ৩। গ, ৪। খ, ৫। ক।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খাদ্য কি? পরিমাণ মত খাদ্য গ্রহণ না করলে কি ক্ষতি হয়?
২. পুষ্টি বলতে কি বুঝেন? পুষ্টিহীনতার কারণ ও তার ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচনা করুন।
৩. সুষম খাদ্য বলতে কি বুঝেন সংক্ষেপে লিখুন। আমরা কি করে সুলভ মূল্যে সুষম খাদ্য পেতে পারি উল্লেখ করুন।
৪. রক্ত কি ধরনের কলা? বিভিন্ন রক্ত কণিকার নাম লিখুন।
৫. ধমনী ও শিরার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।
৬. মানুষের হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ট বিশিষ্ট হবার সুবিধে কি?
৭. সিস্টেমিক সংবহন বলতে কি বুঝেন?
৮. হৃদঘাত কি? আমাদের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে কতবার সঙ্কোচিত হয়?
৯. রক্ত সংবহনতন্ত্র দেহে কি কি কাজ সম্পন্ন করে?
১০. পরিপাকতন্ত্রের তিনটি কাজ উল্লেখ করুন।
১১. ইনসুলিনের উৎস কি? এর কি কাজ?
১২. আন্ত্রিক রসে যে সব উৎসেচক থাকে তাদের নাম লিখুন।
১৩. বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসনের পার্থক্য লিখুন।
১৪. প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস বলতে আমরা কি বুঝি?
১৫. অক্সিজেন কিভাবে দেহকোষে পৌঁছায় তা ব্যাখ্যা করুন।
১৬. শাল দুধ কাকে বলে? এটা শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় কেন?

আ) রচনা ও সমস্যামূলক প্রশ্ন

১. মানুষের রক্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২. মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র বর্ণনা করুন।
৩. সিস্টেমিক সংবহনের বিবরণ দিন।
৪. মানুষের পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৫. একটি ছকের সাহায্যে পরিপাকে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন উৎসেচক, তাদের উৎস এবং যে ধরনের খাদ্যের উপর ক্রিয়াশীল তা উল্লেখ করুন।
৬. পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৭. মানুষের শ্বসন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৮. শ্বসনের সংজ্ঞা দিন। সংক্ষেপে শ্বসনের শারীরবৃত্ত আলোচনা করুন।
৯. 'দুধ একটি আদর্শ খাদ্য'– ব্যাখ্যা করুন।